بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত কাতাদা বিন নোমান আনসারী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাযউন রাজিআল্লাহ আনহুমাদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৬ আগষ্ট ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করবো, যা বিগত বেশ কিছুকাল থেকে চলছে। আজ প্রথমে যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত কাতাদা বিন নো'মান আনসারী (রাঃ)।

হযরত কাতাদার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জাফর পরিবারের সাথে। তার পিতার নাম নো'মান বিন যায়েদ এবং মায়ের নাম ছিল উনায়সা বিনতে কায়েস। হযরত কাতাদার ডাকনাম আবু উমর ছাড়াও আবু আমর এবং আবু আব্দুল্লাহ্ও বর্ণনা করা হয়। হযরত কাতাদা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)'র সৎভাই ছিলেন, অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে ভাই বা বৈপিত্রিয় ভাই। হযরত কাতাদা (রাঃ) সত্তরজন আনসারী সাহাবীর সাথে আকাবার বয়আতে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত কাতাদা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত তিরন্দাজদের একজন ছিলেন, আর বদর, উহুদ ও পরীখার যুদ্ধ ছাড়াও পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদানের সৌভাগ্যলাভ করেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত কাতাদার চোখে তির বিদ্ধ হয়, এতে তার অক্ষিগোলক খুলে বাহিরে বেরিয়ে আসে। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! তিরবিদ্ধ হবার কারণে আমার অক্ষিগোলক বাইরে বেরিয়ে এসেছে, মহানবী (সাঃ) অক্ষিগোলকটি স্বহস্তে পুনরায় যথাস্থানে বসিয়ে দেন আর তা পূর্বাবস্থায় বহাল হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও উভয় চোখের মধ্যে এই চোখটি অধিক শক্তিসম্পন্ন ও বেশি ভালো ছিল। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) সেই চোখে তাঁর মুখের লালা লাগিয়েছিলেন যার ফলে সেটি উভয় (চোখের) মধ্যে অধিক সুন্দর হয়ে যায়। হযরত কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি স্বয়ং এই ঘটনাটি স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র চেহারার সামনে (দাঁড়িয়ে) থাকি। যখনই মহানবী (সাঃ) এর দিকে কোন তির ছুটে আসতো আমি আমার মাথা তাঁর সামনে নিয়ে যেতাম যাতে আমি মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র চেহারার জন্য ঢাল হতে পারি। তখনই একটি তির আমার চোখে বিদ্ধ হয়, যার ফলে আমার অক্ষিগোলক বেরিয়ে গালের ওপর চলে আসে আমি স্বহস্তে আমার অক্ষিগোলকটি ধরি (এই সময়ের মধ্যে শত্রুদলটিও ছত্রভঙ্গও হয়ে পড়ে) আর সেটিকে নিজের হাতে নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হই। অতএব, মহানবী (সাঃ) যখন সেটি আমার হাতে দেখেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয় আর বলেন, হে আল্লাহ্! কাতাদা তার চেহারার মাধ্যমে তোমার নবীর চেহারাকে রক্ষা করেছে। তাই তুমি তার এই চোখকে উভয় চোখের মাঝে অধিক সুশ্রী এবং অধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে দাও। অতএব সেই চোখ উভয়টির মাঝে অধিক সুশ্রী এবং উভয়ের মাঝে দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে অধিক প্রখর ছিল।

হযরত কাতাদা পরিখার যুদ্ধসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু জাফর গোত্রের পতাকা হযরত কাতাদার হাতে ছিল। হযরত কাতাদা ৬৫ বছর বয়সে ২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) মদিনায় তার জানাযার নামায পড়ান। হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রাঃ) বলেন, আনসারদের একটি পরিবার এমন ছিল যাদেরকে বনু উবায়রাক বলা হতো। তাদের মাঝে তিন ভাই ছিল তারা অজ্ঞতার যুগ এবং ইসলামের যুগে তথা উভয় যুগে পরমুখাপেক্ষী এবং অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ছিলেন। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হয় নি। তারা কাজ করতো না বা পরিশ্রম করতো না। যাহোক এ কারণে তারা অনেক বেশি দরিদ্র ছিল। তিনি বলেন, একদা এমন হয় যে, আমার চাচা রিফা বিন যায়েদ ময়দা আটার একটি বস্তা ক্রয় করেন এবং সেটিকে নিজ গুদামে রেখে দেন। সেই গুদামে হাতিয়ার, বর্ম এবং তরবারিও রাখা ছিল, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রও রাখা ছিল। সেই গুদামে সিঁধ কাটা হয় এবং দেয়াল ভেঙে ভেতরে চোর আসে, রেশন এবং অস্ত্রশস্ত্র সব চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। সকালে আমার চাচা রিফা আমার কাছে আসেন এবং বলেন, হে আমার ভাতিজা! গত রাতে আমার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে। আমাদের গুদামের সিঁধ কাটা হয়েছে এবং আমাদের খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা মহল্লায় খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, উত্তরে

আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা বনু উবায়রাককে গত রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে দেখেছিলাম আর আমাদের ধারণা, তোমাদের খাদ্যসামগ্রী দিয়েই তারা আমোদ-প্রমোদ করেছে।

আমার চাচা বলেন, হে আমার ভাতিজা! তোমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে যেতে এবং এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করাতে তাহলে হয়ত আমি আমার মাল-সামগ্রী পেয়ে যেতাম। হযরত কাতাদা বিন নো'মান বলেন, আমি একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, আমাদের লোকদের মধ্য থেকেই এক পরিবার যুলুম ও অন্যায় করেছে। তারা আমার চাচা রিফা বিন যায়েদের বাড়ি গিয়ে তার গুদামে সিঁধ কেটে আর তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং খাদ্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। বনু উবায়রাক একথা শুনার পর তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! কাতাদা বিন নো'মান এবং তার চাচা উভয়ে আমাদের মধ্যকার এক মুসলমান ও ভালো পরিবারের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই চুরির অভিযোগ আরোপ করছে। কাতাদা বলেন, আমি মহানবী (সাঃ) এর কাছে যাই এবং তাঁর সাথে আলোচনা করি। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি এমন এক পরিবারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আরোপ করেছ যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মুসলমান এবং ভাল মানুষ আর তোমার কাছে কোন সাক্ষী-প্রমাণও নেই। কাতাদা বলেন, আমি ফিরে আসি আর আমার মনে হলো এ বিষয়ে মহানবী (সাঃ) এর সাথে কথাবলার চেয়ে আমার কিছু সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়া আমার কাছে শ্রেয় ছিল! মহানবী (সাঃ) এর এই কথা শুনে আমার মনে হলো, আমি অযথাই মহানবী (সাঃ) কে কষ্ট দিয়েছি।

আল্লাহ্তা'লা মহানবী (সাঃ) এর কাছে প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট করেছেন আর এর এই প্রভাবও পড়েছে যে,এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন বনু উবায়রাক, অর্থাৎ যারা চুরির সন্দেহভাজন ছিল তারা ভাবলো যে, এটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, তাই তারা নিজেদের চুরির কথা স্বীকার করে এবং অস্ত্রশস্ত্র মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি (সাঃ) রিফা-কে, যিনি এসবের মালিক ছিলেন, এসব অস্ত্র ফেরত দেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা বিন নোমান (রাঃ) একবার শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করেই সারা রাত কাটিয়ে দেন। সারা রাত সূরা ইখলাস পড়তে থাকেন। মহানবী (সাঃ) এর সামনে যখন এ ঘটনার উল্লেখ হয় তখন তিনি (সাঃ) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ইখলাস কুরআন করীমের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশের সমান। তিনি এ কথাই পরবর্তীতে বলেছিলেন অর্থাৎ, আল্লাহ্তা'লার একত্ববাদই হলো প্রকৃত কুরআন আর কুরআনের মাঝে এরই শিক্ষা পাওয়া যায়।

আবু সালমা থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আমাদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি (সাঃ) বলেন, জুমুআর দিন একটি বিশেষ মুহূর্ত আসে আর তা যদি কোন মুসলমানের ভাগ্যে এমন অবস্থায় জোঁটে যখন সে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ যাচনায় লেগে থাকে তখন খোদা তাকে সেই জিনিস অবশ্যই দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজের হাতের ইশারায় সেই মুহূর্তের খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেন, সে সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, খোদার কসম, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর কাছে গেলে সেই মুহূর্ত সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, এ বিষয় সম্পর্কে তার হয়ত জানা থাকবে। অতএব একবার আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সাঈদ! হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আমাদেরকে এমন একটি মূহুর্ত সম্পর্কে হাদীস শুনিয়েছেন যা জুমুআর দিনে এসে থাকে। ঐদিন এমন একটি মূহুর্ত আসে, আপনার কি সেই সময়টি জানা আছে যাতে দোয়া গৃহীত হয়? জবাবে তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আমি মহানবী (সাঃ) কে এই মূহুর্তটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, প্রথমে আমাকে সেই সময়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে শবে কদরের মতো (তা) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত এই রেওয়ায়েতে জুমুআর দিনের যেই সময়ের উল্লেখ এসেছে সেই সময়টির ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সেসব বর্ণনা থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বা বিষয়ের কথা জানা যায়। প্রথমত এই সময়টি জুমুআ চলাকালীন এসে থাকে; দ্বিতীয়ত এটি দিনের শেষভাগে এসে থাকে, যা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়; আর তৃতীয়ত এটি আসরের নামাযের পর এসে থাকে। এই রেওয়ায়েতগুলোও আমি এখানে তুলে ধরছি।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআর দিনের উল্লেখ করেন এবং বলেন, এতে এমন একটি মূহুর্ত রয়েছে যে যদি এক মুসলমান বান্দা দাঁড়িয়ে নামাযরত অবস্থায় সেই মূহুর্তটি লাভ করে, তাহলে সে যা-ই আল্লাহ্তা'লার কাছে চাইবে, তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর তিনি নিজ হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, সেই মূহুর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এরপর সহীহ্ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা রয়েছে; আবু বুরদা বিন আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন,আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, সেই সময়টি

ইমামের বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। আরেকটি রওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) বলেন, সেটা দিনের শেষ বেলার মুহূর্তগুলোর একটি অর্থাৎ দিবাশেষের একটি মূহুর্ত। আমি বললাম, সেটাকি নামাযের সময় নয়? মহানবী (সাঃ) বলেন, কেন নয়? মু'মিন বান্দা যখন নামায পড়ে এবং বসে থাকে আর কেবল নামাযের অপেক্ষায় থাকে তখন সে যেন নামাযেই থাকে।

এরপর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তা আসরের পরবর্তী সময়। আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু সালমা এই মুহূর্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, آخر ساعة نهار অর্থাৎ এটি দিনের শেষ বেলার কোন এক মুহূর্ত।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তফসীরের একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন,

জুমু'আ এবং রমজানের মাঝে একটি পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান আর তা হলো, জুমু'আও দোয়া গৃহীত হওয়ার দিন আর রমজানও দোয়া কবুলিয়্যতের মাস। জুমু'আ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে আসে ও নীরবে বসে যিকরে এলাহীতে রত থেকে ইমামের জন্য অপেক্ষা করে, অতঃপর প্রশান্তচিত্তে খুতবা শুনে এবং বাজামা'ত নামাযে যোগদান করে তবে তার জন্য বিশেষভাবে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। এছাড়া জুম'আর দিন এমন একটি মুহূর্তও আসে যখন মানুষ যা-ই দোয়া করে তা কবুল হয়ে যায়।

তিনি লিখেন, ঐশী বিধানের অধীনে এই হাদীসের একটি তা'বীর বা ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হবে আর তাহলো কেবল সেসব দোয়াই গৃহীত হয়ে থাকে যা আল্লাহ্‌তা'লার বিধান এবং ঐশী বিধি বিধান অনুযায়ী হয়। কিন্তু যেখানে এটি অনেক বড় পুরস্কার সেখানে এটি তত সহজ বিষয়ও নয়। জুমু'আর সময় দ্বিতীয় আযান অথবা এর কিছুক্ষণ পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ দু'টি সময় যদি একত্রিত করা হয় আর জুমু'আর খুতবা সংক্ষিপ্ত হলেও এই সময় আধা ঘন্টা হয়ে থাকে আর খুতবা দীর্ঘ হলে এই সময় এক-দেড় ঘন্টা ব্যাপী হতে পারে। এই এক-দেড় ঘন্টা সময়ের মাঝে এমন একটি মাহেন্দ্রক্ষণও আসে যখন মানুষ কোন দোয়া করলে তা কবুল হয়ে যায়; কিন্তু নব্বই মিনিট সময়ের মাঝে মানুষ এটি জানে না যে, দোয়া কবুলিয়্যতের সেই সময়টি কী প্রথম মিনিটেই, নাকি দ্বিতীয় মিনিটে, নাকি তৃতীয় মিনিটে। এমনকি নব্বই মিনিটের শেষ পর্যন্ত কোন মিনিট সম্বন্ধে মানুষ নির্দিষ্ট করে একথা বলতে পারবে না যে, সেটি দোয়া গৃহীত হওয়ার সময়। অর্থাৎ দোয়া গৃহীত হওয়ার সেই মুহূর্তটি নব্বই মিনিটব্যাপী অন্বেষণ করতে হবে, আর সেই ব্যক্তিই দোয়া গৃহীত হওয়ার সুযোগ সন্ধানে সফল হতে পারবে যে ব্যক্তি নব্বই মিনিট পর্যন্ত অবিরাম দোয়াতে রত থাকবে আর বিরামহীনভাবে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নব্বই মিনিট দোয়াতে রত থাকা সকলের জন্য সম্ভব নয়; অত্যন্ত দূরূহ একটি ব্যাপার। এতে অবিরত মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে, এটি অনেক পরিশ্রমের কাজ এবং এর জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। এই পুরো সময় মনোযোগ না হারিয়ে মানুষের উচিত নিরন্তর দোয়ায় মগ্ন থাকা, আর এটি অতি আবশ্যক বিষয়। জুমুআর আশিস লাভের জন্য অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

এখন আমি দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন (রাঃ) এর সম্পর্ক ছিল কুরায়েশ গোত্র বনু জামা-র সাথে। তাঁর মাতার নাম ছিল সুখায়লা বিনতে আম্বাস। তিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন ও হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊন এর ভাই ছিলেন। সম্পর্কে তারা সবাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর এর মামা ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন এবং হযরত কুদামা বিন মাযঊন উভয়ে রসূলে করীম (সাঃ) এর দ্বারে আরকামে যাওয়া এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন এবং তাঁর তিন ভাই অর্থাৎ হযরত কুদামা বিন মাযঊন ও হযরত উসমান বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊন ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইথিওপিয়ায় অবস্থানের সময় যখন তারা জানতে পারেন যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে তখন তারা ফিরে এসেছিলেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আমি পূর্বেও কতিপয় সাহাবীদের স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছিলাম যে, যখন মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গেলে মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে বলেন এবং আরো বলেন, ইথিওপিয়ার বাদশাহ একজন ন্যায়বিচারক এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তার রাজ্যে কারো ওপর যুলুম করা হয় না। যাহোক মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে এগারো জন পুরুষ এবং চারজন নারী ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। ইথিওপিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ

জীবন লাভ করে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক যেমনটি বর্ণনা করেছেন মুহাজেরদের ইথিওপিয়ায় যাওয়ার স্বল্প সময়ের ভিতর তারা এক গুজব বা উড়ো খবর শুনতে পায় যে, সব কুরাইশ মুসলমান হয়ে গিয়েছে এবং মক্কায় এখন পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করছে। এই গুজবের ফলে অধিকাংশ মুহাজের কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ফিরে আসে। তারা যখন মক্কার নিকটে পৌঁছে তখন জানতে পারে যে, এই সংবাদ ভুল ছিল এবং মুহাজেরদেরকে ইথিওপিয়া থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাফেরদের একটি কৌশল ছিল মাত্র। এখন তারা সবাই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যাহোক তাদের কাছে আর কোন উপায়ও ছিল না। কেউ কেউ মাঝ পথ থেকেই ফিরে যায় আর কেউ কেউ মক্কার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেই আশ্রয়ও বেশি দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের জন্য মক্কাতে আর কোন নিরাপদ স্থান ছিল না। তাই মহানবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে পুনরায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর অন্য মুসলমানরাও নীরবে নিভৃতে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এবং সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে মক্কা ত্যাগ করতে থাকে। পরিশেষে এই হিজরতের ধারা এমনভাবে শুরু হয় যে, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে আঠারো জন মহিলা আর বাকিরা ছিলেন পুরুষ। যাহোক হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন সম্পর্কে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমবার হিজরত করার পর তিনি ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু জানা যায় না যে তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে গিয়েছিন কিনা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন এখান থেকে পরে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি যখন মদিনায় পৌঁছেন তখন মহানবী (সাঃ) তার এবং সাহাল বিন উবায়দুল্লাহ্ আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) হযরত কুতবা বিন আমেরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊনের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন তার তিন ভাই হযরত উসমান বিন মাযঊন, হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊনের সাথে বদরের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন বদরের যুদ্ধের পাশাপাশি উহুদ, পরিখা এবং অন্যান্য যুদ্ধেও মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফতকালে ত্রিশ হিজরী সনে ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই সকল সাহাবীর পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নত করুন। (আমীন)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
16 August 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org